রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ২৮, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৮ মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪০.৫.২২.০.০.১৬.২০১০(অংশ-১)-২১১—গত ২৪ বৈশাখ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/০৭ মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ **"জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২"** প্রণয়ন করিল।

জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২
(National Labour Policy, 2012)

১.০০. ভূমিকা ঃ

১.০১. মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা ঃ

স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী স্বৈরশাসন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বস্তরের জনগণের সাথে শ্রমজীবী মানুষ বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান সর্বজনবিদিত। বর্তমান শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে অধিকার সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ ও সুস্থ শিল্প

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রত্যাশার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে অধিকতর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টিসহ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াসে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর মাধ্যমে বৈষম্য, শোষণ, দারিদ্র ও কুসংস্কারমুক্ত সৃজনশীল ও কর্মমুখী শ্রমশক্তি গড়ে তোলা।

সর্বস্তরের জনগণের মানসম্মত জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংস্থান ও সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করা একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার এমন একটি ইতিবাচক, বাস্তবমুখী এবং ন্যায়সংগত নীতি অনুসরণ করতে চায় যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি শ্রমিকরাও আন্তরিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকসহ সকল পক্ষের আইন ও ন্যায়সংগত অধিকার এবং দায়িত্ববোধ সুসংহত হবে বলে সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

১.০২. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান শ্রমজীবী মানুষের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ সংবিধান শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষায় কতিপয় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে তাগিদ দিয়েছে যার আলোকে এ শ্রমনীতি প্রণীত।

১.০৩. আন্তর্জাতিক শ্রমমান, অন্যান্য সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ঃ

সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আইএলও সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রমমানসমূহ এবং এ সম্পর্কিত ঘোষণাসমূহের প্রতি সম্মান দেখাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ বিধায় শ্রমজীবী মানুষের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত মর্যাদা এবং অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে সরকার সচেষ্ট থাকবে।

১.০৪. পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ঃ

স্বাধীনতাপূর্বকালে দেশে কোনো কল্যাণমুখী শ্রমনীতি ছিল না। তাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময় প্রণীত বিধি-বিধানের ভিত্তিতেই দীর্ঘকাল এদেশের শ্রমবলয় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতার নির্দেশক্রমে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রণীত হয় দেশের শ্রমনীতি। সেই শ্রমনীতিতেই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্পে শান্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা এবং কল্যাণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ শ্রমনীতি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত হওয়ার পর বিগত ৩০ বছরে শ্রম ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. বেসরকারি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দ্রুত বিকাশ;

২. নিয়োগ ও চাকরির ধরন পরিবর্তন;

৩. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ;

৪. বহুজাতিক কোম্পানির উপস্থিতি ও বিদেশী বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি;

৫. আন্তর্জাতিক শ্রমমান, মানবাধিকারের মানদণ্ড ও শোভন কাজের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারণা এবং এতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ;

৬. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ এবং এ প্রক্রিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ;

৭. দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ;

৮. রপ্তানীমুখী শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অনুষঙ্গ; এবং

৯. সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক শিল্প বাণিজ্যের বিকাশ।

এছাড়া নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮ এর প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার তথা দিন বদলের সনদে জাতীয় শ্রমনীতি পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধনের অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যুগোপযোগী এ জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.০০. বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষিতে শ্রম ও শিল্পে পরিবর্তন ঃ

একুশ শতকের বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিদ্যমান। আশির দশক থেকে এ দেশের শিল্পখাতে উদারিকরণ নীতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বেসরকারিকরণ, দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহের বাধ্যবাধকতার কারণে শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে **"কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার"** শীর্ষক নিম্নোক্ত নীতিমালা ঘোষণা করে ঃ

১. সকল প্রকার বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ;

২. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন;

৩. সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ;

৪. শিশুশ্রমের কার্যকর বিলোপ সাধন; এবং

৫. শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তবতার আলোকে উপর্যুক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

৩.০০. রূপকল্প ২০২১ ঃ

জাতীয় শ্রমনীতি সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এ বর্ণিত শ্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ঃ

১. উৎপাদন ও সেবাধর্মী শিল্প খাতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার;

২. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস;

৩. শিক্ষার হার বৃদ্ধি; এবং

৪. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনশক্তির বিকাশ।

৪.০০. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

৪.০১. লক্ষ্য ঃ

বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

৪.০২. উদ্দেশ্য ঃ

১. সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং কর্মক্ষম সকল নাগরিকের জন্য যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি;

২. জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরী ও ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ;

৩. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা;

৪. শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. দেশী ও অভিবাসী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন;

৬. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের উন্নয়ন;

৭. কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ;

৮. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায় এবং দলিত, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং ভাসমান মানুষসহ প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

৯. সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন; এবং

১০. শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রশাসনকে আধুনিক, যুগোপযোগী, জনকল্যাণমুখী, সেবাধর্মী ও কার্যকর করা।

৫.০০. শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ঃ

শ্রমিকের শ্রম মানব সভ্যতার জনক–এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সরকার শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৫.০১. কর্মসংস্থান ও পেশার নিশ্চয়তা ঃ

সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দায়িত্ব হলো দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

২. চাকরিপ্রার্থী ও চাকরির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রচার করা;

৩. চাকরিরত সকল শ্রমিকের সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডাটাবেজে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ ও তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা ;

৪. শিক্ষানবিসির সুযোগ বৃদ্ধি;

৫. বৈধভাবে কর্মরতদের বিভিন্ন পেশাকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সনদের ব্যবস্থা;

৬. গবেষণার মাধ্যমে কাজের সম্ভাব্য সুযোগসমূহকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

৭. কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা ও কর্মস্থলের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ;

৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান; এবং

৯. শ্রমঘন ও গ্রামীণ এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান।

সরকার এমন কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে না যার দ্বারা কর্মরত শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং কর্মহীনতার সৃষ্টি হয়।

৫.০২. শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন ঃ

কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং চাকরির নিরাপত্তার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাব্য শ্রমিক ও বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে– যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, বিকল্প প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যত চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের আধুনিকায়নের পাশাপাশি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে। এছাড়া শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদান করবে। দক্ষতা উন্নয়নের ধারাকে অধিকতর গতিশীল, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে নারী, তরুণ, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষক তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬.০০. শোভন কাজ ঃ

সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আইএলও'র শোভন কাজ কর্মসূচির সক্রিয় সমর্থক ও অংশীদার হওয়ায় কর্মক্ষম সকল নারী ও পুরুষের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে।

বাংলাদেশ আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে চলমান শোভন কাজের মানদণ্ডসমূহকে জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে এবং

১. চমৎকার কর্মপরিবেশের সফল উদাহরণসমূহ সকলের কাছে তুলে ধরবে;

২. শোভন কাজের উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক (ব্যাংক ঋণ, সুদ ও করের হার হ্রাস) পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৩. স্বীকৃতি প্রদান করবে; এবং

৪. আমদানি সহজিকরণে শোভন কাজের মানদণ্ডকে শর্তাধীন করবে।

৭.০০. ন্যায্য মজুরি ঃ

সরকার শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য মানসম্মত জীবন ধারণ উপযোগী ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার মধ্যে অন্যতম হবে ঃ

১. নিম্নতম মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণ;

২. দ্রব্য মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত মজুরি পর্যালোচনা ও পুনঃনির্ধারণ;

৩. শ্রমিকের দক্ষতা ও কাজের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন স্তরের মজুরি নির্ধারণ; এবং

৪. নারী-পুরুষ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মজুরির বৈষম্য নিরসনসহ বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

ন্যায্য মজুরি ও মজুরির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে এবং শ্রমিক সমাজকে কাজে আত্মনিয়োগে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবে।

৮.০০. উৎপাদনশীলতা ও লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ঃ

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত মালিক ও শ্রমিকের জন্য বর্ধিত উৎপাদন ও লভ্যাংশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা। সঠিক প্রণোদনা ব্যবস্থা উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল পক্ষ (সরকার, মালিক, শ্রমিক, ক্রেতা ও ভোক্তা) কে সমভাবে পরিতৃপ্ত রাখে। সুতরাং, এ লক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করবে। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য হবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৯.০০. শ্রম কল্যাণ ঃ

বিদ্যমান বিভিন্ন সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা ও বিনোদনসহ সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূখী ও সেবামূলক কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোক্তাগণও শ্রমিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।

১০.০০. স্বাস্থ্য সেবা ঃ

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন শ্রমিক নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। তাই তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের কর্মস্থলে ও শ্রমঘন আবাসিক এলাকায় সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তি ও যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালু এবং স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১১.০০. সামাজিক নিরাপত্তা ঃ

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। তাই সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ সকল পর্যায়ে কর্মরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি শর্ত প্রতিপালনের জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবে।

১২.০০. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঃ

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র মালিক, শ্রমিক ও শিল্পসহ সকল পক্ষের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করার মাধ্যমে শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিকশিত হতে পারে। কর্মস্থলে সর্বস্তরের শ্রমিকের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ঝুঁকি ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৩.০০. শিল্প সম্পর্ক, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ঃ

১৩.০১. ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ ঃ

শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকারসমূহ রক্ষা এবং আয় বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সুস্থ ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সংবিধান, শ্রম আইন ও আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কার্যক্রম (গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ) কে উৎসাহিত করতে সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

১৪.০০. অংশগ্রহণ কমিটি ঃ

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও সংলাপের কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক চর্চা উৎসাহিত করা সরকারের কাম্য। তাই সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী অংশগ্রহণ কমিটি গঠন ও তার কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৫.০০. বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ

০১. সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে শিল্পবিরোধ উদ্ভব না হয় এমন পরিবেশ বজায় রাখা এবং সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা। কোথাও শিল্পবিরোধের উদ্ভব হলে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যৌথ আলোচনা, আপোষ-মীমাংসা এবং বিচার ব্যবস্থাসহ, নিষ্পত্তির সকল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার অসৎ শ্রম আচরণকে নিরুৎসাহিত এবং দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সালিশী কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করবে।

০২. বিচার প্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসের জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট থাকবে।

১৬.০০. ত্রিপক্ষীয়তা (সরকার, মালিক ও শ্রমিক) ঃ

এ শ্রমনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা স্বীকৃত ত্রিপক্ষীয়তা (Tripartism)। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত সনদের অনুস্বাক্ষরকারী তাই সরকার শ্রম সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় নীতিমালার শর্ত সমুন্নত রাখবে।

১৭.০০. শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ঃ

কর্মসংস্থান সরকারের একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। কর্মক্ষম ও সম্ভাব্য চাকরি প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করার জন্য সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এ ক্ষেত্রে সরকার একটি গবেষণা সেল ও তথ্য ভান্ডার তৈরী করতে সচেষ্ট হবে।

১৮.০০. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ ঃ

দেশের শ্রম বাজারে প্রতি বছর প্রায় ১৮ থেকে ২০ লক্ষ নতুন শ্রম শক্তি যোগ হচ্ছে, যাদের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তাই আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের উপর নির্ভরশীলতা একটি অনিবার্য বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের বিশাল অবদান অনস্বীকার্য। তাই অভিবাসন ব্যয় যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে হ্রাস, নিরাপদ অভিবাসন ও প্রত্যার্পণসহ অভিবাসীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি ও আইন যুগোপযোগীকরণ, নতুন নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, এ সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার তৈরী ও সে অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট থাকবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসীদের অবদানের গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে সরকার এ খাতকে আলাদা সেক্টর হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পদক্ষেপ নিতে পারবে।

১৯.০০. নারী শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্রে সমতা ঃ

নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের দারিদ্র দূরীকরণ, শ্রমবাজারে নারীর অধিক অংশগ্রহণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে কোন ধরণের বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি নারীর নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও মাতৃত্ব সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে।

২০.০০. শিশুশ্রম নিরসন ঃ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু বিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক ঘোষণায় বাংলাদেশ সক্রিয় অংশীদার। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, শহর ও গ্রামাঞ্চলসহ সকল ক্ষেত্রে শিশুদেরকে যে কোন ধরনের শ্রমে নিয়োগের বিষয়কে সরকার নিরুৎসাহিত করবে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুদের অংশগ্রহণকে নিষিদ্ধ করতে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে (সংবিধান-অনুঃ ১৭) সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা সমুন্নত রাখার স্বার্থে বিশেষ বিশেষ পেশার (জামদানী, তাঁত, কাঠ, মৃৎ ও স্বর্ণ শিল্প ইত্যাদি) ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ প্রশিক্ষণ বলে গণ্য হবে। সরকার শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য ভাণ্ডারে শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করবে।

২১.০০. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক ঃ

দেশের মোট শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। যার মধ্যে রয়েছে– কৃষি, নির্মাণ, গৃহ, পারিবারিক ব্যবসা, চাতাল, ইটভাটা, গ্যারেজ, স্থল ও নৌ-বন্দর, পরিবহন খাত, আসবাব তৈরী, স'মিল, কাঠমিস্ত্রী, ঝালাই, অটোমোবাইল, দোকান, হোটেল-রেস্তোরা, মৎস ও গবাদি খামার, পোল্ট্রি, প্যাকেজিং, কেমিক্যাল কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, ঔষধ শিল্প, স্বনিয়োজিত ইত্যাদি ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারী খাত। এ ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২২.০০. কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সামাজিক দায়বদ্ধতা) ঃ

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর হলো সমাজ ও শ্রম কল্যাণে কোম্পানিসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের বাইরেও অন্যান্য অংশীদার (স্টেকহোল্ডার) তথা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে তাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সিএসআর হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ। সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিসমূহকে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। শ্রম কল্যাণে অন্যান্য যেসব আইন/নীতিমালা রয়েছে সেখানে শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

২৩.০০. সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ডের সমন্বয় ঃ

বেসরকারি খাতের দ্রুত ও ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই সরকারি কার্যক্রম ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়কে সরকার গুরুত্বারোপের মাধ্যমে উভয়ের কার্যক্রমকে সুসংহত ও বিকশিত করতে সহায়তা দিবে।

২৪.০০. শ্রম বিষয়ক আইনের সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ ঃ

সরকার এ নীতির আলোকে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পাশাপাশি শ্রম বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইন ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিধি-বিধানকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৫.০০. অন্যান্য নীতির সাথে সম্পৃক্ততা ঃ

দেশের অন্যান্য নীতির শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত অংশে এ শ্রমনীতির প্রতিফলন থাকবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৬.০০. নীতি বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা ঃ

এ নীতি বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

২৭.০০. শ্রমনীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ঃ

সরকার এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৮.০০. উপসংহার ঃ

বাংলাদেশ এখন পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের অংশ। শ্রম, শিল্প, অর্থ ও বাণিজ্যসহ বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে চলমান পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সম্ভাবনা ও সংকটের মুখে রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত একটি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ার মহৎ আদর্শকে সমুন্নত রাখতে এ শ্রমনীতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ শ্রমনীতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন--বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, শোভন কাজ, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, সামাজিক ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এ শ্রমনীতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সরকার আশা পোষণ করে যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছানোর জন্য এ শ্রমনীতি সরকার, শ্রমিক-মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সম্প্রীতির সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে। সরকার আরো আশা পোষণ করে যে, এ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মহল আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd